ছাত্ররাজনীতির সেকাল ও একাল

নূরুল হক মেহেদী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সম্প্রতি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছেন, "বাংলাদেশে শিক্ষার মান এত নিচে নেমে গেছে, দুনিয়ার কোন দেশে এখানকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। একটা দেশের জন্য এর চাইতে বড় দুঃসংবাদ আর কি হতে পারে? এ সিদ্ধান্তের জন্য বিদেশীদের দোষ দেয়া যায় না, কারণ আমাদের দেশে যে মেধার আকাল ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এতে কারও কোন সন্দেহ নেই। অফিস-আদালতে মেধাবী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হচ্ছে। শোনা যায় অফিসের ফাইল বা লোয়ার কোর্টের মামলা দীর্ঘদিন পড়ে থাকার জন্য বিশেষ কারণ ছাড়াও অর্ডার শীটে মন্তব্য বা নির্দেশ বা রায় লিখার দক্ষতার অভাবেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাইল ছাড়তে বিলম্ব হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মান বজায় রাখা যাচ্ছে না। মেধাবী প্রকৌশলীর অভাবে নির্মাণ কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না এবং প্রায়শ কাজে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞ ও মেধাবী ডাক্তারের সংখ্যালতার দরুন প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য ভারতসহ বিদেশে যাচ্ছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ শিক্ষাঙ্গনগুলোর দুর্দশা এবং শিক্ষার মানের দুঃখজনক অবনতির জন্য সন্ত্রাসকেই দায়ী করছে। সাথে সাথে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আমলা, শিক্ষক, সাংবাদিক, অভিভাবক সকলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলেছেন এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান ভিসি'র শান্তির অন্বেষায় বিভিন্ন প্রয়াস ও প্রচেষ্টা, ক্যাম্পাসে পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি, অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বার বার হল তল্লাশি, প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে যৌথ বৈঠক, শান্তি চুক্তি ও মিষ্টি খাওয়াসহ বহুবিদ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সন্ত্রাসের তাণ্ডব গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করে চলছে ঝড়ো বেগে।

আজ সর্বমহলে একটা প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য বহু প্রেসক্রিপশন দেয়া সত্ত্বেও কোন ওষুধে ধরছে না কেন? অভিজ্ঞ মহলের মতে সন্ত্রাসের উৎস বা কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ছাড়া ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টার কোন ক্রমতি নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে সচেতন মহলও ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাসের উৎস ও কারণ চিহ্নিত করার ব্যাপারে তারা ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে।

এক পক্ষের মতে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য মূলত ছাত্ররাজনীতিই দায়ী, অপর পক্ষ অতীতের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বলে প্রথমোক্তদের বক্তব্য নাকচ করে দেয়। এ দু'টি বিপরীত মতের মধ্যে কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা বেঠিক তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কারণ উভয় পক্ষের হাতে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের উৎস বা সৃষ্টির কারণ নির্ধারণের সাথে সমাধানের পথ ও পন্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছাত্ররাজনীতির কারণে সন্ত্রাস হচ্ছে স্বীকার করার অর্থ সমস্যার সমাধানের স্বার্থে সাময়িকভাবে ছাত্ররাজনীতি স্থগিতসহ এমন কিছু প্রশ্ন এসে যায় যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। আবার প্রথম পক্ষের ধারণা ও যুক্তি যদি সঠিক হয় তবে এ কঠিন অপ্রিয় সত্যকে বাস্তবায়িত করা ব্যতীত ক্যাম্পাস সমস্যার সমাধানও হবে না। ছাত্ররাজনীতিকে সন্ত্রাসের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তদানুসারে সমাধানের পথে পদক্ষেপ নিলে এ মত ও পথের বিরোধীরা অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ছাত্ররাজনীতির ঐতিহ্যকে ম্লান করা, ছাত্রদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক নীতিমালা ও মূল্যবোধ চর্চা থেকে ছাত্র সমাজকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি প্রশ্ন তুলে এ পদক্ষেপের ঘোরতর বিরোধিতায় নামবে। তারা বলবে এ সমাধান মাথাব্যথা সারানোর জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো সমাধান। এমতাবস্থায় এ মতবিরোধের বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে সে কালের ছাত্ররাজনীতি ও একালের ছাত্ররাজনীতির একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ তুলনামূলক চিত্র ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধ মতামত গঠনে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও অতীত। ছাত্রদের চরিত্র, চেতনা ও দায়িত্ববোধ ছিল জাতির গর্বের বস্তু। সেকালের ছাত্র রাজনীতি ছিল জাতীয় রাজনীতির চালিকাশক্তি। তাদের সংগ্রাম গোটা জাতির ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেকালের ছাত্র সমাজ '৫২, '৬২, '৬৯, '৭০ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয় উপমহাদেশে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। এ সকল আন্দোলন দেশ-জাতি ও জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে—কারও ক্ষমতা দখল বা রক্ষার স্বার্থে নয়। অবশ্য এ সকল আন্দোলন থেকেও কোন কোন দল যে লাভবান হয়নি তা নয়। তবে সেটা হয়েছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণে। একালে কোন রাখ-ঢাক নয় ছাত্রসংগঠনগুলো তার মূল দলের ক্ষমতা দখল ও রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে সচেতনভাবে প্রকাশ্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

একালে যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের ঘুঁটির মতো ব্যবহার করে সেহেতু দলীয় ছাত্ররা জঘন্য অপরাধ করলেও দলীয় নেতারা নির্লজ্জভাবে তাদের পক্ষাবলম্বন করে এবং তাদের আস্কারা প্রদান করে। এতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সেখানে আদর্শগত কারণে রাজনৈতিক দলের সাথে ছাত্র সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কোন ছাত্র সংগঠন বা ছাত্রের সমাজবিরোধী অপরাধমূলক কার্যকলাপকে রাজনৈতিক দলগুলো আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়নি। পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে ছাত্রদের মধ্যে মারামারি যে হয়নি তা নয়। সেকালে ছাত্র সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের মূল হাতিয়ার ছিল হকিস্টিক, চেইন, ছুরি ও লাঠি। একালে সন্ত্রাসের হাতিয়ার হলো পিস্তল, কাটা রাইফেল, বন্দুক, স্টেনগান বোমা। ইদানীং এর চেয়েও আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহারের কথা শোনা যায়। সেকালে একটি আদর্শের প্রতি নিবেদিত" প্রাণ, ত্যাগী, কঠোর পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল ও চরিত্রবান কর্মী বাহিনীকে ক্যাডার বলা হতো। একালে ক্যাডার বলতে একদল উচ্ছৃঙ্খল অস্ত্রধারী তরুণকে বোঝায়, যারা কোন ছাত্র সংগঠনের সাইনবোর্ডের তলে থেকে চর দখলের মতো হল দখল, ছিনতাই, চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি এবং খুনোখুনির মতো জঘন্য অপরাধের সাথে যুক্ত থাকে।

সেকালে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র গ্রুপের মধ্যে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দুকযুদ্ধ করে ছাত্রের রক্তে ক্যাম্পাস রঞ্জিত করার লোমহর্ষক ঘটনার কথা কেউ শোনেনি। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের রগকাটার মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতাও এখন ক্যাম্পাসে সংঘটিত হয়। সেকালে একটি সংগঠনের মধ্যে টাঙ্গাইল গ্রুপ, বরিশাল-ফরিদপুর গ্রুপ, শরিয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপ, থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ বা বহুজাতিক গ্রুপ ইত্যাদি ছিল অকল্পনীয়। সেকালে সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও মেয়েরা ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। '৫২-র ভাষা আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম ও নাদিরা বেগমের ভূমিকা সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতো। একালে মেয়েদের মধ্যে চুলোচুলি, মারামারি, বোমাবাজি ও পিস্তলবাজির নির্লজ্জ ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এ পর্যন্ত নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও হত্যার বহু লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে।

সচেতন মহলের একটি অংশের বলিষ্ঠ মত হলো ছাত্ররাজনীতি সন্ত্রাসের উৎস নয়, তাঁদের এ বক্তব্য কে মেনে নিয়েও বলা যায়, ছাত্ররাজনীতির আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চলে। সন্ত্রাসীরা কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের সাইনবোর্ডের নিচে থেকেই সন্ত্রাস করে। ছাত্ররাজনীতিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে বলেই কোন আঘাতই তাদের ঘায়েল করতে পারে না। তারা বীরদর্পে বিচরণ করে ক্যাম্পাসে। ছাত্ররাজনীতির আড়ালে তাদের কুৎসিত চেহারা ঢাকা পড়ে বলেই তারা নেতাও বনে। সংক্ষেপে ছাত্ররাজনীতির আবরণেই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চলে। এ আবরণ খসে পড়ার সাথে সাথে সন্ত্রাসীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হবে। সন্ত্রাসীদের মাথার ওপর থেকে ছাত্রসংগঠনের সাইনবোর্ডটা সরাতে পারলেই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূল করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে। জাতি সমস্যার দ্রুত সমাধান চায়। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে জাতি যে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। তাই জনকণ্ঠের ভাষায় বলি, সাধু সাবধান।

তারিখ ... 29 JUL 1997 ...